মূলপাতা

মগজ ধোলাই

সীরাত পাবলিকেশন

April 1, 2020

9 MIN READ

সম্প্রতি আমার কারাবাসের এক দশক পূর্ণ হলো। যেখান থেকে এ চিঠি লিখছি, সেই ফেডারেল কারাগারেই আমার বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে। এখানে আসার পর থেকে একটি বারের জন্যও এই বিল্ডিং থেকে বের হইনি।

খেয়াল করে দেখলাম, বছরের পর বছর একই জায়গায় থাকলে আশেপাশের সূক্ষ্মতম পরিবর্তনগুলোও চোখে ধরা পড়ে। এই ধাতব খাঁচার কোন শিকে কতটা জং ধরেছে, কোন দেয়াল থেকে কতটা রঙ উঠেছে, সেসবও আমার চোখ এড়ায় না। তার চেয়ে বড় কথা, কয়েদীদের ব্যক্তিত্বের মাঝে ক্রমপরিবর্তনও খুব ভালো করে দেখতে পাই আমি।

ইউয়েন ক্যামেরন একজন সাইকায়াট্রিস্ট। ১৯৬০ সালে একটি লেখায় সে দেখায় যে, দুটি বিষয় আমাদের পরিচয় ধারণে ভূমিকা রাখে। এই পরিচয়কে সে নাম দিয়েছে "টাইম-স্পেইস ইমেইজ"। বিষয় দুটি হলো (ক) ইন্দ্রিয়ের ক্রমাগত ইনপুট, এবং (খ) স্মৃতি। ক্যামেরন ততদিনে সিআইএ'র নিযুক্ত কর্মী। তাদের মাইন্ড কন্ট্রোল প্রোগ্রাম "এমকে-আলট্রা"র উন্নতিসাধনের দায়িত্ব ছিল তার ঘাড়ে। ক্যামেরনের পদ্ধতিটি দুই ধাপবিশিষ্ট। প্রথমটির নাম "de-patterning"। অর্থাৎ, কয়েদীর পরিচয় মুছে ফেলা। এ প্রক্রিয়ায় রয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া, একেবারে জনবিচ্ছিন্ন রাখা, জোর করে নানারকম ড্রাগ সেবন করানো (যেমন chlorpromazine, barbiturates, sodium amytal, nitrous oxide, desoxyn, Thorazine, Nembutal, LSD, PCP, এবং insulin)।

ক্যামেরন গর্বভরে এর ফলাফল সম্পর্কেলিখেছে, "এর ফলে যে শুধু স্থান-কালের অনুভূতি হারিয়ে যায়, তা-ই নয়। বরং যতরকমের অনুভূতি থাকার কথা, তার কিছুই আর বাকি থাকে না। এ পর্যায়ে রোগীর মাঝে আরো কিছু বিষয় দেখা যেতে পারে। যেমন: দ্বিতীয় কোনো ভাষা জানা থাকলে ভুলে যাওয়া, বা বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কেআর কোনো জ্ঞান না থাকা। উচ্চতর পর্যায়ে এমনকি নিজে নিজে হাঁটা ও খাওয়ার ক্ষমতাও চলে যায়। আচরণও অসংযমী হয়ে ওঠে...স্মৃতিশক্তির সবগুলো দিক হয়ে পড়ে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত।"
মোটকথা, ডি-প্যাটার্নিংয়ের ফলে আপনি একদম বাচ্চাকালে ফিরে যাবেন।

এভাবে পরিচয় ধ্বংস করে দেওয়ার পর আসে ক্যামেরনের দ্বিতীয় ধাপ। নাম "psychic driving"। এখানে সে আপনার পুরনো পরিচয়ের জায়গায় নতুন আরেকটি পরিচয় বসিয়ে দেবে। ক্রমাগত বাজতে থাকা একই রেকর্ডিং শোনানো হবে, সারাদিন, প্রতিদিন। চলবে প্রায় তিন মাস জুড়ে। অতীত মুছে ফেলা এবং বর্তমানের পুনঃনির্মাণ।

কারাগারে এই প্রক্রিয়া আরো সূক্ষ্ম। আসামাত্র আপনার সব কাপড়চোপড় খুলিয়ে পরানো হবে কয়েদীর পোশাক। শুরু হবে এক দীর্ঘ যাত্রা, যার শেষে অনেকেই ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া না কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের তৈরি, না কোনো জেলারের। মনে হয় যেন, দুই ধাপের এই মন-নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া স্বয়ং শয়তানের আবিষ্কার:

১) সে মানুষকে বশীভূত করে তার নিজের পরিচয় ভুলিয়ে দেয়: "শয়তান তাদের বশীভূত করে ফেলেছে এবং বিমুখ করেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে।" (৫৮:১৯)

২) তারপর নিজের আওয়াজ দিয়ে সে মানুষের পরিচয় পুনর্গঠিত করে: "নিজের শব্দ দিয়ে যাকে পারিস, তাকে পথচ্যুত কর।" (১৭:৬৪) "মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণাদাতা।" (১১৪:৫)

আসলেই অন্য শক্তির বশে চলে এলে মানুষের আপন পরিচয় ধসে পড়ার উপক্রম হয়। তা সেই শক্তি কোনো ব্যক্তি, কারাগার বা

সংস্কৃতি যা-ই হোক। বহুকাল আগে 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে ইবনু খালদুন লিখেছেন, "অপদস্থ ও পরাধীন থাকার ফলে আসাবিয়্যাহ (জাতিচেতনা) ভেঙে পড়ে।...বনি ইসরাঈলের কথাই ধরুন। মূসা আলাইহিসসালাম তাদের জানালেন যে, তারা শামে রাজত্ব করবে। আল্লাহই এ প্রতিজ্ঞা করেছেন। তবুও তারা সামনে এগোয় না। কারণ মিশরে দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার স্মৃতি তাদের পেছন থেকে টেনে ধরে আছে, এমনকি কিছুটা যেন স্মৃতিকাতরতাও আছে। ফলে একেবারেই মুছে গেছে এদের জাতিচেতনা।"

আত্মসম্মানের চেতনা থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ায় আল্লাহ তাদের সমুচিত সাজা দিলেন: "আল্লাহ তাদের পথহারা করে শাস্তি দিলেন। শাম ও মিশরের মাঝে এক বিরান ভূমিতে তারা চল্লিশ বছর যাবত চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। বসতি গড়া বা অন্য কারো সাথে দেখা হওয়ার সুযোগই থাকল না।"

তারা এক পরিচয়কে আরেক পরিচয় দিয়ে প্রতিস্থাপিত করায় আল্লাহ তাদেরকেই প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ইবনু খালদুনের ব্যাখ্যায়, "স্থায়ী পরাধীন মানসিকতার এই প্রজন্মটিকে বিলীন করে দেওয়াই এভাবে পথহারা করানোর উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বুক থেকে চলে যাওয়ার আগে তারা রেখে যায় নতুন ও আত্মমর্যাদাশীল আরেকটি প্রজন্মকে। তাই শত্রুকে পরাজিত করার এক নতুন ও দৃঢ় জাতিচেতনা নিয়ে তারা বেড়ে ওঠে।"

আজকে আমরা মানসিকভাবে পথহারা, শারীরিকভাবে বিলীয়মান। অবাক হয়ে ভাবি, গত কয়েক বছর ধরে চলমান যুদ্ধগুলো কি আল্লাহর কোনো পরিচ্ছন্নতা অভিযান? এরই মাধ্যমে হয়তো আসবে শক্তসমর্থ এক প্রজন্ম, যারা হবে ইমাম মাহদির যোগ্য সহচর। নাকি এই যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা নতুন করে আবিষ্কার করব আমাদের হারানো পরিচয়?

অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে উনবিংশ গ্রেগোরি শতক পর্যন্ত ইউরোপের প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে। সেসময়ই আমরা নিজেদের আবিষ্কার করি ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড ও ইটালির মতো ঔপনিবেশিক শক্তির পদতলে। ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হতে হতে এমনভাবে আমরা নিজেদের পরিচয় হারিয়ে ফেলি, যা ইতিহাসে প্রথম। পথহারা এই যুগের বর্ণনায় সাইয়িদ কুতুব বলেন, "অপরিবর্তনশীল এবং দৃঢ় একটি আদর্শের প্রয়োজনীয়তা আজকের যুগেই সবচেয়ে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। মানবজাতি যেন এখন কক্ষপথবিচ্যুত এক গ্রহের মতো এলোপাথাড়ি ঘূর্ণায়মান। যেকোনো সময় ধাক্কা দিয়ে অন্যদেরও ধ্বংস করবে, নিজেও ধ্বংস হবে।"

তিনি আরো লিখেন, "আজকের এসব পাগলামি যাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, সে-ই সত্যিকারের আলোকিত জ্ঞানী। মিথ্যে ধারণা ও জীবনব্যবস্থার অনুসারী মানবজাতিকে সে করুণা করে। উপলব্ধি করে যে, মানুষের আচরণ, নৈতিকতা, প্রথা ও অভ্যাস বিকৃত হয়ে গেছে। বদ্ধ উন্মাদের মতো কাপড় ছেঁচড়ে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরায় লিপ্ত তারা। কাপড় পালটানোর মতোই এদের নৈতিকতাও পালটায়। ব্যথায় চিৎকার করে, কখনও হাসে পাগলের মতো, শিকারীর তাড়া খাওয়ার মতো দৌড়ায়, মাতালের মতো টলে, মহামূল্যবান রত্ন ছুঁড়ে ফেলে ধূলো-কাদা-পাথরে মাখামাখি করে।"

কিছু পরেই সাইয়িদ কুতুব বলেন, "মানুষের চেহারা, চলাফেরা, আর পোশাকের দিকে তাকান। তাদের চিন্তা, ধ্যানধারণা আর বাসনার ভেতর দৃষ্টি দিন। দেখবেন তারা ভীত, আতঙ্কিত, ও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিধারী। আসলে তারা নিজেরাই ক্ষুধার্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, হতবিহ্বল সত্তার কাছ থেকে পালাচ্ছে। স্থিতিশীল কোনোকিছু আঁকড়ে ধরতে পারছে না, পারছে না স্থায়ী কোনো অক্ষকে ঘিরে আবর্তিত হতে।"

এক কথায়, সাইয়িদ কুতুব নিজের অতীত জীবনের কথাই বলছেন। একসময় তিনি সেক্যুলার সাহিত্যসমালোচক ছিলেন। সেসময় ইসলাম তাঁর কাছে খুব একটা গুরুত্ব বহন করত না। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন আব্দুন নাসিরের শাসনব্যবস্থার সমালোচক। উপলব্ধি করেন যে, মিশরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। পশ্চিম থেকে ধ্যানধারণা আমদানি করা শাসকদের সমালোচনায় মুখ খুলতে থাকেন তিনি। যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে তিনি চাকরি করতেন, তারা তাঁকে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় পাঠান। মনে আশা, হয়তো স্বচক্ষে দেখে তিনি পশ্চিমের প্রতি নরম হবেন। ওয়াশিংটনে উইলসন'স টিচার্স' কলেজ, কলোরাডোতে গ্রীলি কলেজ এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে স্ট্যানফোর্ডইউনিভার্সিটিতে তাঁর সময়

অতিবাহিত হয়। কিন্তু ফল হলো একেবারে উলটো। আমেরিকার নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুপূজারি সমাজের বেহাল দশা দেখে সাইয়িদ কুতুবের চোখ আরো খুলে যায়। মিশরে ফিরে আসার সময় তাঁর মনে আরো বদ্ধমূল হয় যে, ইসলামই এই বিপর্যয়ের একমাত্র ঔষধ।

সরকারি চাকরি ছেড়ে তিনি লেখালেখির মাধ্যমে মানুষের চোখ খুলে দিতে শুরু করেন। পশ্চিমা উপনিবেশায়নের ফলে নিজেদের ভূমি হারানোকে তিনি সবচেয়ে বড় ক্ষতি মনে করতেন না। বরং নিজেদের পরিচয় হারানোটাই তাঁর মতে সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি। ক্যামেরনের পেশেন্টদের মতোই ডি-প্যাটার্নড করে ফেলা হয়েছে আমাদের। নির্মম অত্যাচারের পরও যে পথনির্দেশনা মুসলিম সমাজকে হাজার বছর ধরে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রেখেছিল, তা মুছে ফেলা হয়েছে সজ্ঞানে। ওই পেশেন্টদের মতোই মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে কৃত্রিম পরিচয়। সাইয়িদ কুতুব বলেন, "ইসলামি শিক্ষার স্থায়িত্ব ও ত্রুটিহীনতার বোধ হারিয়ে ফেলার পর থেকেই মুসলিম সমাজে দুর্বলতা ও অবক্ষয় নেমে আসে। ফলে শত্রুরা সহজেই আমাদের ইসলামকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিমা ধ্যানধারণা গিলতে শেখায়।"

তো কীসের বদলে কী এলো? পশ্চিমারা ব্যক্তিগত পরিসর বলতে যা বোঝে, ইসলামকে সে পরিসরেই সীমাবদ্ধ একটি ধর্ম বলে মনে করা শুরু হয়। এটি কিছু গ্রহণযোগ্য আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও আচার-প্রথার সমষ্টি। যুদ্ধ, প্রশাসন বা আনুগত্যের মতো বিপদজনক ব্যাপারে এর কোনো নির্দেশনা থাকবে না। মানে যত ইচ্ছে নামাজ-রোজা করুন, কিন্তু আপনাকে একইসাথে ভালো মুসলিম এবং অনুগত ঔপনিবেশিক দাস হতে হবে!

আরো দুঃখের ব্যাপার হলো, বাইরের শত্রু ভেতর থেকেই অনেক সাহায্য পায়। বিশ্বাসঘাতকতার চরমে পৌঁছালে আমাদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ মুসলিম মানসের ভেতর বিজাতীয় ও জাহিলি ধ্যানধারণা আমদানি করতে থাকে। সাইয়িদ কুতুবের মতে, এই ঘরের শত্রুরা ইসলামকে পশ্চিমের মাপকাঠিতে বিচার করে। অথচ করা উচিত ছিল উলটোটা। মাপকাঠির এই পরিবর্তনের ফলেই তাদের মাঝে তৈরি হয় দাস-মনোভাব। কারাগারে অবস্থান করেই সাইয়িদ কুতুব লিখেছেন, "এই পণ্ডিতদের সমস্যা হলো, এরা জাহিলি প্রথাকেই স্বাভাবিক মনে করে। সেই প্রথার ছাঁচের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে মেলাতে চায়।...আসলে আল্লাহর দ্বীনই স্বাভাবিক। জাহিলি বাস্তবতাকেই এর ছাঁচে পরিবর্তিত হতে হবে।"

সমস্যা চিহ্নিত করার পর তিনি ব্যাখ্যা করেন, "এ পরিবর্তন সাধারণত একভাবেই হয়...আর তা হলো জাহিলিয়্যাতের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত করার এক আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষের জীবনে শুধুই আল্লাহর শরিয়াহ প্রয়োগ করবে, ফলে তাদের মুক্তি দেবে তাগুতের দাসত্ব থেকে।"

কিন্তু সাবধান! "এই আন্দোলনে ফিতনা, ক্ষতি এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। কেউ মুরতাদ হয়ে যাবে...অপরদিকে কেউ আল্লাহর সাথে সৎ থেকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে, অর্জন করবে শাহাদাহ। কেউ আবার ধৈর্য ধরে এসব পরীক্ষা সহ্য করে যাবে, যতদিন না আল্লাহ চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন এবং পৃথিবীতে সত্যকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে দেন। ইসলামি ব্যবস্থা তখনই হবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর একে প্রতিষ্ঠিত করতে যারা কঠোর শ্রম দিয়েছে, মূল্যবোধে তারা হবে অনন্য। জাহিলি সমাজে মানুষ যা কামনা-বাসনা করে, সেই সমাজের মানুষের কামনা-বাসনা হবে তার চেয়ে একেবারেই আলাদা।"
তারপর তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি এখন সময় এসেছে ইসলামের প্রচারকদের মনে ইসলামের সুমহান মর্যাদাকে ধারণ করার। জাহিলিয়্যাতের খাপে বসানোর এক নিকৃষ্ট যন্ত্র হিসেবে যেন একে আর না দেখা হয়।"

বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট ইসলামি পরিচয়ের গুরুত্বের ব্যাপারে তিনি বলেন, "আল্লাহ তখনই তাঁর আউলিয়াগণকে বিজয় দিয়েছেন, যখন তাঁরা আগে নিজেদেরকে শত্রুদের থেকে পৃথক করে নিয়েছেন। আল্লাহর পথে আহ্বানের গোটা ইতিহাসে এমনটিই হয়ে এসেছে। আল্লাহর শত্রুদের থেকে আকিদার দিক দিয়ে আলাদা হতে হয়। তাদের শির্কিকর্মকাণ্ড থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করতে হয় প্রকাশ্যে। মিথ্যে উপাস্য ও তাগুতের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দিতে হয়। প্রত্যাখ্যান করতে হয় এই তাগুতের অবৈধ বিশ্বাস, আইন ও আচারপ্রথা।"

সবশেষে বলেন, “বাহ্যিকভাবে আলাদা হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সময় লাগতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে আলাদা হতে হবে একদম শুরু থেকেই। একটি জাতিকে দু দলে বিভক্ত করাটা ধীর প্রক্রিয়া। প্রজন্মের পর প্রজন্মও লেগে যায়। কিন্তু মুমিনদের ক্ষুদ্র দলটির অন্তরকে যেন এই বাহ্যিক বাস্তবতা আচ্ছন্ন করে না ফেলে। কারণ এর চেয়ে বড় বাস্তবতা হলো আল্লাহর দেওয়া বিজয়ের ওয়াদা।”

সাইয়িদ কুতুব যে সময়টিতে কারাগারে বসে ওপরের কথাগুলো লিখছিলেন, ঠিক সেসময় পৃথিবীর আরেক প্রান্তে ইউএস সরকারের চাকর ইউয়েন ক্যামেরন কারো পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টায় রত। এর কিছুকাল পরেই সাইয়িদের ফাঁসি হয়। অথচ তিনি কেবল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন, যেন অজ্ঞাতসারে কেউ তাদেরকে ডি-প্যাটার্নড করে দিতে না পারে।

* * *

।।মগজ ধোলাই।।
মূল: তারিক মেহান্না
অনুবাদ: © সীরাত পাবলিকেশন